দ্য রিমেইনস অব দ্য ডে

কাজুও ইশিগুরো

অনুবাদ

দুলাল আল মনসুর

দ্য রিমেইনস অব দ্য ডে
কাজুও ইশিগুরো
অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩৫০ টাকা

THE REMAINS OF THE DAY a novel by Kazuo Ishiguro Translated by Dulal Al Mansur Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2019 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 350 Taka RS: 350 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94102-8-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

২০১৭ সালে কাজুও ইশিগুরোর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেও বাংলাদেশের পাঠক মহলে তাঁর পরিচিতি ছিল। মূলত 'দ্য রিমেইনস অব দ্য ডে' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে তাঁর বুকার পুরস্কার জয়ের পর থেকেই আমাদের দেশের পাঠকের কাছে তিনি পরিচিতি পান। এরপর থেকে ইশিগুরোর আরো অনেক লেখাই সব পাঠকের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের মতো মনে হয়েছে। যেমন ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'দি আনকনসোলড'-এর কথা বলা যায়। এ উপন্যাসটি তাঁর পাঠক সমালোচকদের চমকে দেয়। পাঁচশ পৃষ্ঠা পার হয়ে যাওয়া এ উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন চেতনা প্রবাহের শৈলীতে। দ্য গার্ডিয়ানের প্রধান সাহিত্য সমালোচক জেমস উডসহ কতিপয় সমালোচক ইশিগুরোর এ উপন্যাসটির বিরূপ সমালোচনা করেন। উড বলেন, 'এ উপন্যাসটি খারাপের এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।' ঔপন্যাসিক ও শিল্প সমালোচক প্রফেসর অনিতা ব্রুকার প্রথম দিকে এ উপন্যাসের প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ করলেও পরে মন্তব্য করেন, 'এটা তো প্রায় একটা মাস্টারপিস উপন্যাস হয়েছে।' ইশিগুরোর ২০০০ সালে প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'হোয়েন উই অয়ার অরফানস'। ২০০৫ সালে প্রকাশ করেন 'নেভার লেট মি গো'। ইশিগুরো চিত্রনাট্য লিখেছেন, গানও লিখেছেন।

'দ্য রিমেইনস অব দ্য ডে' উপন্যাসের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে প্রথম পুরুষে, প্রধান চরিত্র স্টিভেনসের বয়ানে। উপন্যাসের কাহিনি তার ডায়েরির মতো উপস্থাপনে এগিয়ে যায় বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে সত্তর পর্যন্ত। উপন্যাসের পুরোটাই স্টিভেনস এবং তার প্রাক্তন সহকর্মী মিস কেন্টন সম্পর্কে— কেন্টনের সঙ্গে স্টিভেনসের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে।

কোরীয়-আমেরিকান ঔপন্যাসিক চ্যাং-রে লি, নিউ ইয়র্কে জন্মলাভ করা এশীয়-আমেরিকান ঔপন্যাসিক এড পার্ক, এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান কবি ঔপন্যাসিক তাও লিন, নিউ ইয়র্কে জন্ম নেওয়া এশীয়-আমেরিকান ঔপন্যাসিক গিশ জেন, এশিয়ায় বাল্যকাল কাটানো আরেক এশীয়-আমেরিকান ঔপন্যাসিক আলেক্সান্ডার চি, সাংহাইয়ে জন্ম নেওয়া আমেরিকান ঔপন্যাসিক জেনি ঝ্যাংসহ আরো অনেক এশীয় ইংরেজিভাষী লেখক তাঁদের কথাসাহিত্যে প্রথম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। কথক চরিত্র লেখকদের পরিচয় থেকে অনেক দূরের মানুষ হিসেবেই পরিচয় পেয়েছে। ঔপন্যাসিকরা যথার্থ দূরত্বে রেখেছেন নিজেদের পছন্দ অপছন্দের বিষয়। মোটেও কথকের মধ্যে মেশাননি তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতি। তাঁদের সবার মতোই কাজুও ইশিগুরোও প্রথম পুরুষের বয়ান ব্যবহার করেছেন তাঁর এ উপন্যাসে।

এক সঙ্গে একই জায়গায় কর্মরত অবস্থায় মিস কেন্টনের কথাবার্তা এবং বিভিন্ন আচরণে স্টিভেনস বুঝতে পারে, মিস কেন্টনের মনে তার জন্য একটা টান তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে কেন্টনের ইশারায় সাড়া দিতে পারে না। তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে পাঠকের মনে ধারণা যতটা স্পষ্ট স্টিভেনসের নিজের মনে ততটা না হলেও ধারণাটা ঠিকই জন্মে। স্টিভেনসের মনে কেন্টনের জন্য টান তৈরি হলেও সে ওপরে ওপরে একটা অজুহাত তৈরি করে আবেগের টানটাকে ঢেকে রাখে, পিছিয়ে দেয়। সে বার বার কেন্টনকে বোঝাতে চায়, তাদের মধ্যে একটা চমৎকার পেশাগত সম্পর্ক আছে। শুধু কষ্টের সামাজিক কারণে নয়, তার ব্যক্তিগত আবেগের কারণেও স্টিভেনস নিজেকে বিরত রাখে কেন্টনের দিক থেকে। পেশার প্রতি অতি মাত্রায় আত্মনিবেদনের ফলে পেশাগত জীবনের পুরোটাই সে অন্য মানুষের সেবায় ব্যয় করে। এমনকি ওপরঅলাদের সেবা করতে করতে বাবার মৃত্যু মুহূর্তেও নিজেকে বাবার সামনে রাখতে পারে না সে।

স্টিভেনসের মানসিক অবস্থাটা উপন্যাসের প্রথম দিকে পুরোপুরি খুলে দেখানোর চেষ্টা করেন না ইশিগুরো। কাহিনি ধীরে ধীরে যতটা শেষের দিকে এগোতে থাকে স্টিভেনসের প্রত্যাশার চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টা করে তাকে না পেয়ে তার ওপরে অভিমান করে কেন্টন পেশা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। স্টিভেনস তার মতো থেকে গেলেও জীবনের একটা সময় সে বুঝতে পারে, তার তরফ থেকে কেন্টনকে অবহেলাই করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক দিন পর কেন্টনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার জীবনের আরো অনেক বিষয় জানতে পারে স্টিভেনস। তখন নিজের এবং কেন্টনের দূরত্বটা কত বড় তা উপলব্ধি করতে পারে সে:

এবার আমি বুঝতে পারি, তাদের এ সব ব্যাপার আমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়; আমার নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যেতে হবে, আমি যেন তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা না করি। অবশ্য যদি গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত কারণে করতে হয় সেটা আলাদা ব্যাপার। যেমন ডার্লিংটন হলের বর্তমান স্টাফ সংকটের ব্যাপারটা এখানে আসতে পারে। অন্যদিকে মিস কেন্টন অবশ্য তার সমস্যার কথা আমার কাছে বলার ব্যাপারে তেমন কিছু মনে করছেন বলে মনে হলো না। আর আমাদের তো দীর্ঘ দিনের শক্ত পেশাগত সম্পর্ক ছিলই। সেই সম্পর্কেরই প্রমাণস্বরূপ তার ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা শুনতে ভালো লাগতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম, মিস কেন্টন তার স্বামী সম্পর্কে সাধারণ কথাবার্তা বলা শুরু করলেন: স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তিনি খুব শীঘ্রই অবসরে যাবেন। তার মেয়ের কথা বললেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সামনের শরতে মেয়ের সন্তান হওয়ার কথা। তিনি মেয়ের ডরসেটের ঠিকানাটাও দিলেন আমাকে। বললেন, আমি ফেরার পথে তার মেয়ের সাথে দেখা করলে মেয়ে নাকি অনেক খুশি হবে। আমি জানালাম যাওয়ার সময় আমি ডরসেটের ওপর দিয়েই যাবো, তবে ওখানে ওঠা হবে না। তবু তিনি

জোরাজুরি করতেই লাগলেন। বললেন, ক্যাথরিন আপনার সম্পর্কে সব জানে, মি. স্টিভেনস। আপনাকে দেখলে ও দারুণ খুশি হবে।

ইশিগুরোর উপস্থাপনার মধ্যে নিরিবিলি নিচু কণ্ঠের প্রবাহ চলতে থাকে। প্রচণ্ড ঢেউ তোলার মতো আবেগী আন্দোলন আশা করা যায় না তাঁর লেখার মধ্যে। 'দ্য রিমেইনস অব দ্য ডে' উপন্যাসেও যথরীতি তেমন বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। অভিজাত মানুষদের বাড়িতে কর্মরত দুজন সাধারণ কর্মচারীর জীবনের ঘটনা আপাত আকর্ষণীয় মনে হবে না। ইশিগুরোর উপস্থাপনাতেও তেমন হৈচৈ ফেলে দেওয়ার মতো কোনো কৌশল নেই। তিনি নীরবে কিছু সাধারণ কথা বলে যান। তার মধ্যেই ধৈর্যশীল পাঠকের কিছু পাওয়ার থাকতে পারে। স্টিভেনস এবং মিস কেন্টনের জীবনের কথাগুলোর পাশে পাশে আরো আস্তে বলা কিছু কথা আছে। সেগুলো ইতিহাসের একটা গুমোট সময়ের চিত্র প্রায় অস্পষ্টতার মতো করে অবলীলায় তুলে ধরে। আর ইশিগুরোর উপন্যাসটি শেষ করার পরে বোঝা যায়, তিনি এটি লিখেছেন অনেক কৌশলে, অনেক পরিকল্পিত কায়দা কানুনে। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলোর মতো কিছু ছক দেখতে পাওয়া যায় এ উপন্যাসের শিরোনাম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

সচেতন এবং দায়িত্বশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সাহিত্যের মঙ্গলের কথা ভাবেন। পাঠকদের কাছে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেলে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁর নোবেল ভাষণে লেখক পাঠকদের কাছে অনুরোধ রেখে বলেন, 'প্রথমত: আমাদের সাধারণ সাহিত্য জগৎকে আরো প্রসারিত করতে হবে। আমাদের প্রথম বিশ্বের সংস্কৃতির এলিট অঞ্চল, যে অঞ্চলকে আমরা নিরাপত্তার এবং স্বস্তির মনে করি সেখানকার বাইরের জগতের কণ্ঠও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আজ পর্যন্ত আজানা আছে এমন সাহিত্যিক সংস্কৃতির জগৎ থেকে আরো উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে রত্ন খুঁজে নিতে হবে। লেখকরা অনেক দূরবর্তী দেশে থাকতে পারেন কিংবা আমাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেও থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত: ভালো সাহিত্যের উপাদানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার সময় আমাদের দৃষ্টি যেন অতিমাত্রায় সংকীর্ণ এবং রক্ষণশীল না হয়ে যায় সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। পরবর্তী প্রজন্ম গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর গল্প বলার নতুন এবং মাঝে মাঝে বিহ্বলকর পদ্ধতি নিয়ে আসবে। তাদের প্রতি আমাদের মন উদার রাখতে হবে। বিশেষ করে সাহিত্যের শাখা এবং আঙ্গিক বিষয়ে তাদের সবচেয়ে ভালো সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি এবং সেটার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারি। ভয়ানক রকমের বিভাজনের সময় অন্যের কথা শোনার জন্যও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। ভালো লেখা, ভালো পাঠ সব বাধা ভেঙে ফেলবে। আমরা নতুন কোনো ভাবনা পেয়ে যেতে পারি, মহান কোনো মানবীয় দৃষ্টি পেয়ে যেতে পারি যেখানে আমরা সবাই সমবেত হতে পারব।'

দুলাল আল মনসুর

প্রবেশক : জুলাই ১৯৫৬

ডার্লিংটন হল

বেশ কয়েক দিন ধরে আমার মাথার ভেতর একটা ভ্রমণের কথা ঘুরছে। সত্যিই হয়তো এ ভ্রমণে আমাকে যেতে হবে। যাওয়ার সম্ভাবনাটা ক্রমেই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। এ ভ্রমণকে একটা অভিযানই বলব। আমাকে একাই যেতে হবে এ অভিযানে। মি. ফ্যারাডে'স ফোর্ডের মন রক্ষার্থে যেতে হবে। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, ইংল্যান্ডের পল্লী এলাকার অনেকখানি পার হয়ে এ ভ্রমণ আমাকে ওয়েস্ট কান্ট্রির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভ্রমণ আমাকে ডার্লিংটন হল থেকে পাঁচ-ছয় দিনের জন্য দূরে নিয়ে যাবে। উল্লেখ করা দরকার, সপ্তাহ দুয়েক আগে একদিন বিকেলবেলা আমি লাইব্রেরির ছবিগুলো পরিষ্কার করছিলাম। মি. ফ্যারাডে সদয় হয়ে আমাকে এই ভ্রমণের কথাটা বললেন। আমি একটা মইয়ের ওপরে উঠে ভিসকাউন্ট ওয়েবার্লির একটা পোর্ট্রেট পরিষ্কার করছিলাম। কয়েকটা বই হাতে মি. ফ্যারাডে এলেন। মনে হয়, বইগুলো তাকে তুলে রাখার জন্য আমাকে দিতে এসেছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানানোর সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছেন, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের মাঝে পাঁচ সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে চান।

তাঁর পরিকল্পনার কথা জানানোর পর বইগুলো একটা টেবিলে রেখে আমার মনিব দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে একটা আরাম চেয়ারে বসলেন। তারপর আমাকে বললেন, স্টিভেনস, তুমি বুঝতে পারছ তাহলে, আমার বাইরে থাকার পুরোটা সময় তুমি এই বাড়িতে বন্দি থাকো তা আমি আশা করি না। গাড়িটা নিয়ে কোথাও চলে যাও না কেন? কয়েক দিন থেকে আসো কোথাও! তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি ছুটি পেলে ভালোই কাজে লাগাতে পারবে।

তাঁর কথাগুলো একদমই অপ্রত্যাশিতভাবে শুনে তাৎক্ষণিক বুঝতে পারি না, কী জবাব দেব এ রকম পরামর্শের। মনে পড়ছে, তাঁর সুবিবেচনার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। তবে সুনির্দিষ্ট অন্য কোনো কথা বলিনি মনে হয়। কারণ আমার মনিব আবার বলা শুরু করলেন, আমি কিন্তু সিরিয়াস, স্টিভেনস। আমি আসলেই চাই, তোমার একটা ছুটি নেওয়া উচিত। আমি গ্যাসের বিল দিয়ে দেব। তোমার মতো মানুষ এ রকম বড় বড় বাড়িতে আটকে থেকে বাসিন্দাদের শুধু সাহায্য-সহযোগিতা করে যাও। কোথাও বের হও না। তোমার নিজের এই সুন্দর দেশটা কী করে দেখতে পারো, বলো তো!

তিনি যে এবারই প্রথম এ রকম প্রসঙ্গ তুললেন, তা নয়। এ প্রসঙ্গ তাঁকে সত্যিই ভাবায় মনে হয়। এইবার তাঁর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমার তরফ থেকে একটা উত্তর মনে হয় তৈরি হয়ে যায়। মইয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে আমার মনে হয়, আমার মতো পেশায় যারা কাজ করে তাদের একদিক থেকে দেশ দেখা হয়েই যায়, যদিও আমরা পল্লী এলাকা ঘুরে বেড়াতে পারি না, কিংবা ছবির মতো সুন্দর সব জায়গা দেখতে বের হতে পারি না তবু ইংল্যান্ডকে আমরা অনেকের চেয়ে বেশিই দেখতে পারি। কারণ আমরা যেসব বাড়িতে কাজ করি সেখানে দেশের মহান নারী-পুরুষরা জমায়েত হয়ে থাকেন। অবশ্য মি. ফ্যারাডের কাছে এ বিষয়টা এভাবে তুলতে পারি না; কেননা এ রকম কথা বললে বোধহয় আমার খানিক অহং প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।

আমি এটুকু বলেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখি, এই বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই এত বছর ধরে আমি ইংল্যান্ডের মহান যা কিছু আছে সব দেখে ফেলেছি। এটা আমার জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয়, স্যার।

মি. ফ্যারাডে আমার কথা বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো না। কারণ তিনি আগের কথার রেশ ধরে বলতে থাকলেন, আমি সত্যি বলছি, স্টিভেনস। কেউ তার নিজের দেশের সৌন্দর্য দেখতে পারবে না, এটা তো অন্যায়। তুমি আমার উপদেশ শোনো। এই বাড়ির গণ্ডি থেকে বের হয়ে কয়েক দিনের জন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে এসো।

আপনাদের যেমন মনে হতে পারে, আমারও তেমনই মনে হয়েছিল। ওই দিন বিকেলে মি. ফ্যারাডে যা যা বললেন আমি মোটেই সত্যি বলে নিইনি। ইংল্যান্ডের মানুষ সাধারণত কী করে, কী করে না—সে বিষয়ে আমেরিকার কোনো ভদ্রলোকের জানার কথা নয়। সে রকম অজানারই একটা উদাহরণ তাঁর প্রস্তাবটাও। তখন আমার আপাতত তা-ই মনে হলো। তাঁর এই পরামর্শের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী দিনগুলোতে বদলে যায়। সত্যিই ক্রমবর্ধমানভাবে আমার চিন্তাভাবনার অনেকখানি দখল করতে থাকে ওয়েস্ট কান্ট্রিতে ভ্রমণে যাওয়ার প্রসঙ্গটি। একদম গোপন না করেই বলা যায়, মিস কেন্টনের চিঠি আসার সঙ্গে এ প্রসঙ্গও একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাসের কার্ড বাদ দিলে গত সাত বছরে তাঁর পাঠানো এটিই প্রথম চিঠি। তবে এখনই এই মুহূর্তে বিষয়টি আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে, মিস কেন্টনের চিঠি সম্পর্কে আমি কী বলতে চেয়েছি। আমি আসলে বলতে চেয়েছি, মিস কেন্টনের চিঠি আসার সঙ্গে এখানকার, মানে ডার্লিংটন হলের, কিছু পেশাগত কর্মপ্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আরো জোর দিয়ে বললে, এ রকম কিছু পেশাগত বিষয়-আশয় আমার মনিবের সদয় পরামর্শটা সম্পর্কে আমাকে নতুন করে ভাবতে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে আমার তরফ থেকে আরো বিশদ বলা দরকার।

সত্যটা হলো, কয়েক মাস ধরে আমার কর্তব্য পালনে বারবার বেশ কয়েকটা

ভুলত্রুটি করেছি। বলা দরকার, এ ভুলগুলো ব্যতিক্রমহীনভাবেই একেবারে মামুলি পর্যায়ের। তবু আশা করি, আপনারা বুঝতে পারবেন, যার এ রকম ভুলত্রুটি করার অভ্যাস নেই তার কাছে বারবার এ রকম ভুল করা একটা বিব্রতকর ব্যাপারই বটে। ভুলগুলোর কারণ নিয়ে আমি সতর্কতামূলক সব রকমের তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখার চেষ্টাও করেছি। এ রকম ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে আমার বেলায়ও তা-ই হয়েছে। আসল কারণের দিকে আমার নজরই যায়নি। মিস কেন্টনের চিঠির একটা ইঙ্গিত নিয়ে আমি গভীর চিন্তাভাবনায় মগ্ন হয়ে যাই। সেখান থেকেই একটা সরল সত্যের দিকে আমার চোখ খুলে যায় : আমার সাম্প্রতিক ভুলগুলোর পেছনে আসলে মারাত্মক কোনো অশুভ কারণ নেই। আসল কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ স্টাফ-প্ল্যান।

অবশ্য প্রত্যেক বাটলারেরই দায়িত্ব হলো স্টাফ-প্ল্যান তৈরিতে তার সর্বোচ্চ সতর্কতা ঢেলে কাজ করা। কে জানে কত ঝগড়াঝাটি, কত মিথ্যা অভিযোগ, অপ্রয়োজনীয় কর্মী ছাঁটাই, কত সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার হ্রস্ব হয়ে যাওয়ার পেছনে একজন বাটলারের স্টাফ-প্ল্যান তৈরির গড়িমসি থাকতে পারে? অনেকেই বলে, একজন মার্জিত বাটলারের দক্ষতার মূল ভিত্তি হলো ভালো স্টাফ-প্ল্যান তৈরি করা। সত্যিই বলতে পারি, আমি তাদের সঙ্গে একমত। এত বছর ধরে আমি নিজে কত কত স্টাফ-প্ল্যান তৈরি করেছি। আমার তৈরি স্টাফ-প্ল্যানের খুব কমই সংশোধন করতে হয়েছে বললে খুব অযৌক্তিক গর্ব করা হয় না। আর বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে স্টাফ-প্ল্যান তৈরিতে যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি পাওয়া যায় তাহলে অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যাবেই না, শুধু আমিই দায়ী। একই সময়ে বলা দরকার যে এবারে আমার কাজটা ছিল বেশ কঠিন পর্যায়ের।

ঘটনা ছিল এ রকম : ডার্লিংটন পরিবারের দুইশ বছরের মালিকানার পর তাদের কাছ থেকে ফ্যারাডে সাহেবের মালিকানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ফ্যারাডে সাহেব জানালেন, তিনি এখনই এই বাড়িতে বসবাস শুরু করছেন না। তাঁর আমেরিকার কাজকর্ম শেষ করতে মাস চারেক সময় লাগবে। তিনি বেশ জোর দিয়েই চাইলেন, তাঁর আগের মালিকের আমলে যারা ডার্লিংটন হলে কর্মচারী ছিল তাদেরই যেন রেখে দেওয়া হয়। তিনি অবশ্য এরই মধ্যে এখানকার কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনেছেন। কর্মচারী বলতে অবশ্য মাত্র ছয়জনের একটা ক্ষুদ্র দল; তাদের লর্ড ডার্লিংটনের আত্মীয়রাই রেখেছেন। মালিকানা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত এবং মালিকানা হস্তান্তর করতে যত দিন সময় লাগে তত দিন পর্যন্ত বাড়ির সব কিছু দেখাশোনা করার জন্য আগের মতোই রাখা হয়েছিল সবাইকে। দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হচ্ছে, যখন বাড়িটা কেনা শেষ হয়ে গেল তখন কর্মচারীদেরও ছাঁটাই হওয়ার সময় এসে গেল। তখন শুধু মিসেস ক্লিমেন্টের অন্য কর্মসংস্থানের উদ্দেশে চলে যাওয়া ঠেকানো ছাড়া আর কারো জন্য কিছু করতে ফ্যারাডে সাহেবকে বলার মতো আমার তরফ থেকে আর কিছু ছিল

না বললেই চলে। ওই পরিস্থিতিতে আমার অনুতাপের কথা জানিয়ে আমার নতুন মনিবকে চিঠি লিখলাম। উত্তরে তিনি নতুন স্টাফ নিয়োগের আদেশ পাঠালেন। 'পুরনো আলিশান ইংরেজ' বাড়িটা দেখভাল করার মতো উপযুক্ত স্টাফ নিয়োগ করার কথা তিনি জানালেন আমেরিকা থেকে। অনতিবিলম্বে আমি ফ্যারাডে সাহেবের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে লেগে গেলাম। কিন্তু সবারই জানা আছে, ইদানীং সন্তোষজনক মানের নিয়োগদান অত সোজা কাজ নয়। আর যদিও মিসেস ক্লিমেন্টের সুপারিশক্রমে রোজমেরি ও অ্যাগনেসকে পেলাম, গত বছর বসন্তে ফ্যারাডে সাহেব সংক্ষিপ্ত সফরে যখন আটলান্টিক পেরিয়ে আমাদের পারে চলে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার কাজকর্ম উপলক্ষে সাক্ষাৎ হলো সে সময় পর্যন্ত আর কাউকে তেমন পেলাম না। ওই সময়ই প্রথম তিনি ডার্লিংটন হলের অদ্ভুত রকমের প্রায় ফাঁকা স্টুডিওতে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। তবে ওই মুহূর্তে আমরা একজন আরেকজনের কাছে অপরিচিত নই। কর্মচারী নিয়োগের প্রসঙ্গ ছাড়াও বেশ কয়েকবার কিছু গুণের কথা আমার নতুন মনিব উল্লেখ করলেন যেগুলো আমার মধ্যে পেলে তাঁর পক্ষে নির্ভরযোগ্য হবে। আমার জন্য সৌভাগ্যের হবে। সুতরাং আমার মনে হয়, তিনি আমার সঙ্গে তখন থেকেই বাস্তববাদী ভঙ্গিতে বিশ্বাস নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। কথাবার্তা শেষে এখানে সব কিছু তাঁর বসবাসের উপযোগী করে সাজানোর জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিলেন তা নেহাত অল্প নয়। যা-ই হোক, আসল কথা হচ্ছে, ওই সাক্ষাতের একপর্যায়ে আমি কথাটা তুলতে সমর্থ হলাম যে ইদানীং উপযুক্ত স্টাফ নিয়োগ দেওয়া বেশ কঠিন। কিছুক্ষণ ভাবার পর ফ্যারাডে সাহেব আমাকে অনুরোধ করেই বললেন, আমি যেন আমার সাধ্যমতো স্টাফ-প্ল্যান তৈরি করি। 'গৃহকর্মীদের এক ধরনের রোটা' ব্যবহার করতে বললেন তিনি। এই রোটা অনুসরণ করে চারজনের স্টাফ দিয়ে বাড়ির সব কাজকর্ম চালাতে বললেন। চারজন মানে মিসেস ক্লিমেন্ট, দুটো মেয়ে আর আমি। তাঁর পরামর্শমতো কাজ করা মানে বাড়ির বিভিন্ন অংশ একেবারে 'মোড়কে মুড়িয়ে' রাখতে হবে। তবে তিনি বুঝিয়েও দিলেন, আমি যেন এত সব নজরদারিতে আমার কাজের অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দিয়ে খরচের মাত্রাটা যথাসম্ভব নিচের দিকে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার তো মনে পড়ে গেল, একসময় আমার অধীনে এখানে সতেরোজন স্টাফ কাজ করত। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, ডার্লিংটন হলে আটাশজন কর্মচারী কাজ করত। এসব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় এই একই বাড়ি মাত্র চারজন দিয়ে চালানোর পরিকল্পনা করার বিষয়টা বলতে গেলে ভয়াবহই মনে হলো আমার। অবশ্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করতে লাগলাম, আমার ভীত ভাবটা যেন প্রকাশ না পেয়ে যায়। আমার অবিশ্বাস যেন নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করল : ফ্যারাডে সাহেব যেন আমাকে সাহস দিচ্ছেন এমনভাবে বললেন, যদি খুব প্রয়োজন পড়ে তাহলে আরো একজন স্টাফ কাজে

লাগানো যেতে পারে। তবে তিনি আবারও বললেন, আমি যদি চারজন দিয়েই চালাতে পারি তাহলে যেন বাড়তি কারো কথা আর না ভাবি। তাহলে তিনি বেশ স্বস্তি পাবেন, এমন কথাও জানাতে ভুললেন না ফ্যারাডে সাহেব।

আমাদের অনেকের মতোই আমারও এখানকার পুরনো নিয়ম-নীতি বদলানোর ব্যাপারে অনিচ্ছা। তবে এ কথাও ঠিক, অনেকে ঐতিহ্যকে এমনি এমনি ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। এ রকম চেষ্টার মধ্যে তেমন মহান কোনো ব্যাপার কিছু নেই। এখনকার আধুনিক সময়ে বিদ্যুৎ ও হিটিং সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। কাজেই এক প্রজন্ম আগে যেসংখ্যক কর্মচারী ছিল এখন আর তেমনটি দরকার নেই। সত্যিই আমার নিজের মনেই বেশ কিছুদিন এ রকম একটা ধারণা জাগ্রত ছিল : শুধু ঐতিহ্যের খাতিরে আগের মতো বিপুলসংখ্যক কর্মচারী কাজে লাগানো হলে তাদের হাতে খুব বেশি অলস সময় থাকবে এবং সেটা তাদের নিজেদের জন্যই অস্বাস্থ্যকর হবে। সেটা পেশাগত মানেরও অবনতি ঘটার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে থাকবে। তা ছাড়া ফ্যারাডে সাহেব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, ডার্লিংটন হলে আগে যেমন ঘন ঘন অনেক মানুষজন নিয়ে সামাজিক জমায়েতের মতো অনুষ্ঠান হতো তেমনটা তিনি করবেন না। তিনি পরিকল্পনা করেছেন, তেমন সামাজিক অনুষ্ঠান কালেভদ্রে হতে পারে। তারপর ফ্যারাডে সাহেব আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা ঠিকমতো করার জন্য মনোনিবেশ করি। স্টাফ-প্ল্যান নিয়ে চিন্তাভাবনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। অন্য দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য যত ঘণ্টা ব্যয় করি স্টাফ-প্ল্যান নিয়েও কমপক্ষে ততটা সময় ব্যয় করি। কিংবা ঘুমানোর জন্য শুয়ে যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ শুধু স্টাফ-প্ল্যান নিয়েই ভাবতে থাকি। যখনই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, আমি একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি, তখনই সেটাতে সব রকমের সতর্কতা প্রয়োগ করে চারপাশ থেকে দেখার চেষ্টা করি। শেষে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলি। অবশ্য সেটা ফ্যারাডে সাহেব যেমনটা বলেছিলেন তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না আমার। তবে মনে হলো, সেটাই সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা। কারণ আমার নিশ্চিত মনে হলো, মানুষের পক্ষে এ রকম পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সিদ্ধান্ত নিলাম, বাড়ির প্রায় সব আকর্ষণীয় স্থান চালু রাখতে হবে। পেছনের পাশের করিডর, দুটো স্টিলরুম, পুরনো লন্ড্রিসহ গৃহকর্মীদের বর্ধিত আবাস এবং মেহমানদের জন্য রক্ষিত দোতলার করিডর—এগুলোর পুরোটাই কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যাতে ধূলার আস্তরণ না পড়ে। শুধু নিচতলার প্রধান রুমগুলো এবং মেহমানদের রুমগুলো বাদ রাখতে হবে। এসব বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের এই লঘুসংখ্যক স্টাফ দিয়েই কাজ করে যেতে হবে। মাঝেমধ্যে শুধু দিনমজুরদের সাহায্য নেওয়া যাবে। আমার স্টাফ-প্ল্যানের মধ্যে একজন মালির সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত করা হলো : সপ্তাহে এক দিন, গ্রীষ্মে দুই দিন আসবে এবং দুজন ক্লিনার সপ্তাহে দুই দিন করে আসবে। পরিকল্পনায় আরো রাখা হলো, আমাদের

চারজনের নিয়মিত ডিউটির মধ্যে রদবদল ঘটানো হবে। আগে থেকেই বলে দেওয়ার মতো বিশ্বাস আমার মধ্যে তৈরি হলো যে অল্পবয়সী মেয়ে দুটোর জন্য এ রকম পরিবর্তন মেনে চলা খুব কঠিন হবে না। আর আমার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম, মিসেস ক্লিমেন্টের যেন কষ্টের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে পারি। সে জন্য সবচেয়ে বেশি দায়দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করলাম। একজন বাটলারের জন্য এ রকম দায়দায়িত্ব নেওয়া অবশ্য অবিশ্বাস্য রকমের উদার মনের পরিচায়ক।

এমনকি এখনো আমি বলব না, এটা একটা খারাপ স্টাফ-প্ল্যান ছিল। মোটের ওপর এ রকম পরিকল্পনার কারণেই তো মাত্র চারজন মানুষের পক্ষে এত এত দায়দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তবে আপনারা একমত হবেন, যে স্টাফ-প্ল্যানে দু-চারটে ভুলত্রুটির কথা বিবেচনায় রাখা হয় সেটাই সবচেয়ে ভালো স্টাফ-প্ল্যান, বিশেষ করে যখন কোনো কর্মী অসুস্থ হয় কিংবা কোনো না কোনো কারণে সাধারণ মানের চেয়ে নিচে হয়ে থাকে তার সার্বিক যোগ্যতা। অবশ্য এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমাকে খানিকটা অসাধারণ কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। তবু যত দূর সম্ভব ভুলত্রুটির মাত্রা কমিয়ে রাখার ব্যাপারে মোটেও অমনোযোগী ছিলাম না। আমি বিশেষভাবে সতর্ক ছিলাম, আগের দায়দায়িত্ব পালনের চেয়ে অতিরিক্ত দিতে গেলে যেকোনো রকম জোরাজুরিতে মিসেস ক্লিমেন্ট ও মেয়ে দুটোর মনে জটিল ধারণা তৈরি হতে পারে, তাদের কাজের চাপ আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। স্টাফ-প্ল্যান নিয়ে কাটানো দিনগুলোতে এ রকম একটা বিষয়ে আমি বেশ অনেকটা চিন্তা খরচ করেছি যে মিসেস ক্লিমেন্ট ও মেয়েদুটোকে যে অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে—এমন ধারণা থেকে যদি একবার সরিয়ে আনতে পারি তাহলে এই দায়িত্ব বণ্টনকেও তারা উত্তেজনাকর এবং লঘু মনে করবে।

অবশ্য এখনো আমার মনে সেই সময়ের আশঙ্কা রয়েই গেছে, মিসেস ক্লিমেন্ট ও মেয়ে দুটোর সমর্থন পাওয়ার জন্য আমার ভেতরে দুশ্চিন্তা ছিল; আমি কঠোরভাবে ভেবেই দেখিনি, আমারও সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। যদিও আমার অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা এ রকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া থেকে আমাকে বিরত করেছে, তবু নিজেকে একটা সীমার মধ্যে আটকে রাখার দিকে আমি যেন অমনোযোগী ছিলাম। তাহলে আমার সতর্কতা যদি এ কয়েক মাস ধরে অল্প মাত্রায় হলেও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে আর বিস্ময়ের কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করি, দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজেকে আমি বেশি মাত্রায়ই উৎসর্গ করে দিয়েছি। এ সত্যের মধ্যে কোনো জটিলতা থাকার কথা নয়। আরো বলতে পারি, আমার সতর্কতার বিষয়টি এর চেয়ে বেশি জটিলতা তৈরি করেওনি আদৌ।

আপনাদের কাছে মজার মনে হতে পারে, স্টাফ-প্ল্যানে এত বড় একটা ধ্রুব ঘাটতি নিশ্চয় আমার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে আপনারা এ রকম

কথাও নিশ্চয় মানবেন, কেউ যখন একটা দীর্ঘ এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে এ রকম একটা বিষয়ে এত বেশি চিন্তাভবানা নিবেদন করে থাকে তখন এমনটিই ঘটে থাকে। বাহ্যিক কোনো ঘটনার কারণে কারো টনক না নড়লে এ রকম পরিস্থিতিতে সত্য এমনি এমনি সাধারণত কারো সামনে স্পষ্ট হয়ে এসে দাঁড়ায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে, বলতে গেলে, মিস কেন্টনের চিঠিই আমাকে আমার স্টাফ-প্ল্যান নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। তাঁর চিঠিতে বরাবরের মতো খোলাসা না হলেও দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে ডার্লিংটন হলের জন্য তাঁর স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ করেছেন এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এখানে ফিরে আসার জন্য বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। শুধু তখনই আমার মনে হলো, আরে, পরবর্তী স্টাফের একজন সদস্য তো এখানে আসলেই একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে! আসলে আমার চিন্তাভাবনার এ রকম ঘাটতিই আমার সাম্প্রতিক সমস্যাগুলোর কেন্দ্রে ছিল। এই ঘাটতিটা নিয়ে আমি যত ভেবেছি আমার কাছে একটা বিষয় তত পরিষ্কার হয়ে এসেছে, এই বাড়িটার জন্য মিস কেন্টনের দারুণ মায়া-মমতা রয়েছে; তাঁর পেশাগত জ্ঞানবুদ্ধিও অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হওয়ার মতো। এ রকম পেশাগত দক্ষতার দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ডার্লিংটন হলের জন্য একটা পুরোপুরি সন্তোষজনক স্টাফ-প্ল্যান তৈরিতে আমাকে সক্ষম করার জন্য মিস কেন্টন একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে এসেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতির এ রকম বিশ্লেষণ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাডে সাহেবের কয়েক দিন আগের মহানুভব পরামর্শটা আবার আমার মাথায় চলে এলো। আমার মনে হলো, ব্যক্তিগত গাড়িতে করে ভ্রমণটাকে একটা পেশাগত কাজে লাগানো যেতে পারে। মানে আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে ওয়েস্ট কান্ট্রিতে চলে যেতে পারি। আমি সশরীর মিস কেন্টনের সঙ্গে দেখা করতে পারি। এখানে ডার্লিংটন হলে কাজ করতে আসার যে ইচ্ছা তার আছে সেটা কতখানি বাস্তব তা-ও ঠিক ঠিক জেনে বুঝে আসতে পারি। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আমি মিস কেন্টনের সাম্প্রতিক চিঠিগুলো পুনরায় বেশ কয়েকবার করে পড়লাম। এখানে তাঁর কাজ করতে আসার ইঙ্গিতগুলোর উপস্থিতি যে শুধু আমার কল্পনা, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এসব কারণে বেশ কয়েক দিন আমি কিছুতেই ফ্যারাডে সাহেবের সামনে প্রসঙ্গটা তুলতেই পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম, সামনে এগোনোর আগে আমার নিজের কাছে ভ্রমণ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় খোলাসা করা দরকার। যেমন প্রথমেই বলা যায় খরচের কথা। আমার মনিবের 'গ্যাসের বিল দিয়ে দেওয়া'-সংক্রান্ত উদারতার কথা মাথায় রাখলেও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তো বিরাট অঙ্কের খরচের কথা আসেই। যেমন ধরা যেতে পারে থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ, তারপর রাস্তায় হালকা কোনো নাশতা খেলে তার খরচ। তারপর এ রকম ভ্রমণে কোন ধরনের পোশাক মানানসই হবে সে প্রসঙ্গেও ভাবতে হবে। আমার

নিজের পক্ষে পোশাকের জন্য কিছুটা খরচ করা উচিত কি না, সে কথাও মাথায় রাখতে হবে। আমার বেশ কয়েক সেট দারুণ স্যুট আছে। বেশ কয়েক বছরে ডার্লিংটন সাহেব দয়া করে নিজে আমাকে এগুলো দিয়েছিলেন। তারপর আরো অনেক মেহমান এখানে ছিলেন এবং আমাদের সেবায় খুশি হয়ে তাঁরাও বেশ কিছু পোশাক দিয়ে গেছেন। যে রকম ভ্রমণের কথা ফ্যারাডে সাহেব বলেছেন তেমন ভ্রমণে আমার স্যুটগুলোর বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত ফরমাল হয়ে যাবে মনে হয়। কিংবা সেগুলো এখনকার সময়ের জন্য বড্ড সেকেলেও হয়ে যেতে পারে। তবে একটা লাউঞ্জ স্যুটের কথা মনে আছে; সেটা স্যার এডওয়ার্ড ব্লেয়ার নিজে আমাকে দিয়েছিলেন ১৯৩১ কিংবা ১৯৩২ সালে। তখন সেটা একদমই নতুন ছিল, ঠিক আমার মাপমতোই ছিল। আমি যে গেস্টহাউসে থাকব সেখানকার সান্ধ্য লাউঞ্জ কিংবা ডাইনিং রুমের জন্য বেশ মানানসই হতে পারে ব্লেয়ার সাহেবের দেওয়া স্যুট। আমার যেটা নেই সেটা হলো ভ্রমণের পোশাক। মানে, গাড়ি চালানোর সময় আমার পরনে যে পোশাক মানানসই হতে পারে। অবশ্য অল্পবয়সী লর্ড চ্যামার্স যুদ্ধের সময় আমাকে যে স্যুটটা দিয়েছিলেন সেটাও মানাবে গাড়ি চালানোর সময়। সেটা দেখতে অবশ্য স্পষ্টভাবেই মনে হবে আমার মাপের চেয়ে অনেক খাটো। তবে রঙের কথা মাথায় রাখলে সেটাও দারুণ মানাবে। শেষে আমি হিসাব করে দেখলাম, নিজের ঘাড়ে সব খরচ নিলে আমার জমানো টাকা দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। আর বাড়তি হিসাবে পোশাকের খরচও চালানো যাবে ওই টাকার মধ্যেই। আশা করি, শেষের এই বিষয় সম্পর্কে আপনারা আমাকে অস্বাভাবিক রকমের বেকুব মনে করবেন না। কেউ যদি জাহির করতে চায়, সে ডার্লিংটন হল থেকে এসেছে, তার পক্ষে নিজের এ রকম বেকুবির কথা না বোঝাটাই স্বাভাবিক। আরো বড় কথা হচ্ছে, এ রকম কাজের সময় নিজের অবস্থানের সঙ্গে মানানসই পোশাকই পরিধান করা উচিত।

এইবার আমি আরেক কাজেও সময় বেশ খরচ করলাম : রাস্তার ভূচিত্রাবলি খুঁটিয়ে দেখতে এবং মিসেস জেন সিমোনসের 'দ্য ওয়ান্ডার অব ইংল্যান্ড' বইটির প্রাসঙ্গিক ভলিউম পড়তে ভালোই সময় ব্যয় করলাম। মিসেস সিমোনসের বইটি সাত খণ্ডে লেখা। একেক খণ্ড ব্রিটিশ ভূখণ্ডের একেকটা অংশ নিয়ে লেখা হয়েছে। আপনি যদি মিসেস সিমোনসের বইপত্র সম্পর্কে না জানেন তাহলে আপনাকে আমি বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব পড়ে দেখতে। তাঁর বইগুলো লেখা হয়েছে ত্রিশের দশকে। কিন্তু তাঁর লেখার বেশির ভাগই এখনো প্রাসঙ্গিক। মোটের ওপর, আমি নিজেও মনে করি না, জার্মানদের ফেলা বোমা ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। বাস্তব কথা হলো, যুদ্ধের আগে মিসেস সিমোনস এই হাউসে প্রায়ই আসতেন। এই হাউসে আসা মেহমানদের মধ্যে যাঁরা এখানকার স্টাফ সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কর্মচারীদের কাছে তিনি জনপ্রিয়ও ছিলেন। আমাদের প্রশংসা করার সময় তিনি